তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

প্রস্তাবনা

একদা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। একদিন এর ঐশ্বর্য ও প্রতাপের কাছে দিল্লীও নাকি লজ্জা পেত। তবে মুর্শিদাবাদ নামক ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই জেলাটির নামকরণ খুব বেশী দিনের নয়। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে দেওয়ানখানা তদানীন্তন মক্সুদাবাদ বা মখ্সুসাবাদ শহরে সরিয়ে নিয়ে এসে নিজের নাম অনুসারে শহরের নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদার হলে মুর্শিদাবাদ সুবা বাংলার রাজধানী হয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নাম থেকেই জেলাটি পরিচিত হয় মুর্শিদাবাদ নামে। মুর্শিদাবাদ জেলাটির বয়সও বেশী নয়।১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলা বর্তমান রূপ পেয়েছে। তার আগে এই ভূখণ্ডের অঞ্চলগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এর আকার এবং আয়তনও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ নামক এই ভূ-খণ্ডটির ইতিহাস কিন্তু যেমন আকর্ষণীয় তেমনই গৌরবের। অখণ্ড বাংলার অন্যতম ইতিহাস-সমৃদ্ধ জেলা এই মুর্শিদাবাদ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শু(করে আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ের চিহ্ এই মুর্শিদাবাদের মাটিতে রয়ে গিয়েছে। একদিন বাংলার প্রথম গৌরবময় গৌড়রাজ্য এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। আবার এগারশ বছর পরে এই মুর্শিদাবাদেই বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

দেশ-পরিচয়

ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলাকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। দুই দিকে দু'টি ভূ-খণ্ড রাঢ় ও বাগড়ী নামে পরিচিত। রাঢ় অঞ্চল অতি প্রাচীন, বাগড়ী অঞ্চল গঙ্গা, ভাগীরথীর পলিমাটিতে গড়া অপে(াকৃত অনেক নতুন ভূ-খণ্ড। ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ দ(িণ-তীরবর্তী ভূভাগ রাঢ় ও পূর্বদিক অর্থাৎ বাম-তীরবর্তী অঞ্চল বাগড়ী। এই দু'টি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি, এমনকি অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য। অর্থাৎ প্রশাসনিক দিক থেকে একটি অঞ্চল হলেও ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই জেলা সম্পূর্ণ দু'টি পৃথক অঞ্চল। পশ্চিম অর্থাৎ রাঢ় অংশে পা(বর্তী বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটি অচ্ছেদ্য অংশ এবং পূর্ব অর্থাৎ বাগড়ী অঞ্চল ভাগীরথীর পূর্বে অবস্থিত নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন। প্রাচীন কাল থেকে ভাগীরথী ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ। পনের ষোল শতক থেকে পদ্মার খাত দিয়ে গঙ্গার মূল স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। তখন থেকেই পদ্মা ত্র(মশঃ স্ফীতকায়া এবং ভাগীরথী শীর্ণ হয়ে পড়ে এবং রাঢ় ও বাগড়ী পরস্পর নিকটবর্তী হতে থাকে। ত্র(মশঃ এই দুটি অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা প্রায় ঘুচে যায় এবং দুটি ভূখণ্ড একত্রে একটি জেলায় পরিণত হয়। আবার ঠিক একই কারণে এই অঞ্চল উত্তর দিকের পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলে পরিণত হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় অন্ততঃ পনের ষোল শতক পর্যন্ত জেলার দুটি অংশ দুটি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত(ছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেবল দুটি অংশে ভাগ করেছিল তাই নয়, এই নদী সম্পূর্ণ পৃথক দুটি দেশ বা রাষ্ট্রের সীমারেখা ছিল। দেশ দুটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক কালে এই দুটি দেশ প্রধানতঃ রাঢ় বা রাঢ়া অথবা গৌড় এবং বঙ্গ বা বঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। বলাবাহুল্য গৌড় পশ্চিম এবং বঙ্গ পূর্ব অংশ।

রাঢ়ঃ ভৌগোলিক দিক থেকে রাঢ় অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অঞ্চল অতি প্রাচীন দেশ। এই অঞ্চলের ভূমি উচ্চ ও দৃঢ়বদ্ধ, মাটি শক্ত(, কঙ্করময়। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তে রাজমহল শৈলমালার কঠিন ভূমি ত্র(মশঃ নিচু হয়ে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই উচ্চ ভূমির পূর্ব প্রান্তে মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল। এই উচ্চ ভূমির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় রাঙামাটি অঞ্চলে। বাস্তবিক ভাগীরথীর তীরবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চল ছাড়া বাকী অঞ্চলটি উচ্চ, দৃঢ়-কর্দমময় ও স্থানে স্থানে কঙ্করময় লাল অথবা প্রায় লাল মাটির দেশ। জেলার উত্তর প্রান্তে গুমানি, তারপর দ(িণে যথাত্র(মে বাগমারী, বাঁশলোই, পাগলা, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরা(ী, কোপাই বা কুয়ে নদীগুলি রাজমহল পাহাড় কিম্বা পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই নদীগুলি ভাগীরথী অপে(া অনেক প্রাচীন। এই রাঢ় দেশের দুটি ভাগ- উত্তর রাঢ় ও দ(িণ রাঢ়, যথাত্র(মে অজয় নদের উত্তর ও দ(িণ অঞ্চল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের একটি অংশ নিয়ে উত্তর রাঢ়। ভূমি প্রাচীন বলেই এই অঞ্চলে জনবসতি অতি

MURSHIDABAD 3 # 70
21-9-2003

প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ অঞ্চলে জনবসতি ছিল।

কজঙ্গল ঃ কজঙ্গল রাঢ় দেশের উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান রাজমহল ও চতুর্দিকের অঞ্চল বলে মনে করা হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াং কজঙ্গলের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে ধরে নেওয়া যায় কজঙ্গলের একটি অংশ, বিশেষ করে দ(িণ-পূর্বাংশ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশের অন্তর্গত ছিল। কজঙ্গলও অনেক প্রাচীন দেশ।

কর্ণসুবর্ণ ঃ প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াং বা হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণ দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। য়ুয়ান চোয়াং এর বিবরণ ছাড়া আর কোথাও কর্ণসুবর্ণ নামক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ইতিহাস বিখ্যাত নগর। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য ভেঙ্গে অনেকগুলি রাজ্যে পরিণত হয়। কর্ণসুবর্ণ নগরী এবং তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চলকেই য়ুয়ান-চোয়াং সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ দেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই দেশের আয়তন বেশী নয় ,পরিসীমা ৪৪৫০ লি অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ মাইল। ফার্গুসনের মতে বর্ধমানের উত্তরাংশ, সমগ্র বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ ছাড়াও নদীয়া ও যশোহর (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার উচ্চ অঞ্চল সমূহ কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত ছিল।

বাগড়ী ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অঞ্চলটি সাধারণতঃ বাগড়ী নামেই পরিচিত। এ অঞ্চলও কোন বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূখণ্ড নয়। পার্শ্ববর্তী নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার সঙ্গে এই অঞ্চলের তেমন কোন পার্থক্য নাই। এই অঞ্চলের ভূমি নিম্ন, মাটি দোঁ-আঁশ অথবা বেলে ও অত্যন্ত উর্বর। জলবায়ু আর্দ্র। গঙ্গা-পদ্মার পলিমাটিতে গড়া এই দেশ অপে(াকৃত অনেক নতুন ভূখণ্ড। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, পাঁচ হাজার বছর আগে এ দেশে মনুষ্যবসতি ছিল না। রাঢ় অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনেক অর্বাচীন। ভাগীরথীর প্রবল ও বিস্তৃত স্রোত এই অঞ্চলকে দীর্ঘদিন রাঢ় অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আবার পদ্মার বিস্তার তখন খুব কম হওয়ায় প্রাচীন পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এই অঞ্চলের নৈকট্য ছিল অনেক বেশী। বাস্তবিক পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল অপে(া উত্তরের রাজশাহী জেলার সঙ্গেই এই অঞ্চলের সাদৃশ্য বেশী।

অধিবাসী ঃ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতই মুর্শিদাবাদ জেলার জনগোষ্ঠীতেও বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। এ দেশের আদিম অধিবাসীরা মিশে আছেন হিন্দু সমাজের নানা বর্ণের মধ্যে। মুর্শিদাবাদে আর্য জাতির আগমন ঘটেছিল বাংলায় আর্য অধিকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। উত্তর ও দ(িণ ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষও এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমরাভিযানে অংশ গ্রহণ করে এদেশে এসে এদেশেই থেকে গিয়েছেন, এমন নিদর্শনও আছে।

কনৌজ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থের এদেশের আগমনের সত্যতা ও সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুর্শিদাবাদে অন্ততঃ তেরটি গ্রাম (পাতেণ্ডা, গুড়া, ঝিকড়া, বালিগ্রাম প্রভৃতি) এই বহিরাগত ব্রাহ্মণদের ও বেশ কয়েকটি স্থান (জজান, কান্দী, পাঁচথুপি প্রভৃতি) কায়স্থদের আদি বাসস্থান বলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের কুলজী গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে। ভট্টবাটির ভট্টরা দা(িণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে আগত বলে জানা যায়। বুন্দেলখণ্ডের ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সবিতা রায় (দী(িত) মানসিংহের সঙ্গে সমর-অভিযানে এসে ফতেসিং পরগণায় (কান্দী মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল) বসতি স্থাপন করেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁরা স্বদেশ থেকে অনেক আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতিকে এনে এই জেলায় বসবাস করান। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজকার্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে বহু ব্যক্তি(ই এ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। বেশ কিছু সংখ্যক রাজপুত মানসিংহের সঙ্গে ও অন্যান্য সময়ে এসে মিঠিপুর (জঙ্গীপুরের সন্নিকটে) প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। আরও কয়েকটি অঞ্চলেও অনেক রাজপুত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিহার প্রদেশ থেকে লালা পদবীধারী অনেক কায়স্থ ব্যবসায়ী নবাব আমলে মুর্শিদাবাদ শহর ও জেলার অনেক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ব্যবসা উপল(্যে রাজস্থানের জৈন ব্যবসায়ীরা নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে আসেন। তাঁরা এখন প্রধানতঃ জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কাশিমবাজার এবং আরও কয়েকটি শহরে বসবাস করেন।

মুসলমান আত্র(মণের সময়ে এবং পরবর্তী কালে বহু মুসলমান ভারতবর্ষের বাইরে থেকে (প্রধানতঃ তুর্কীস্থান, আরব, পারস্য) এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের বংশধরগণই এখন এদেশের মানুষ। এই সব সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অধিকাংশই মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল, বিশেষ করে ভরতপুর, সালার প্রভৃতি অঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ শহরের অধিবাসী। তবে মুর্শিদাবাদের মুসলমান জনসমাজের প্রায় সকলেই এই দেশেরই মানুষ।

এক কালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামরিক প্রয়োজনে অনেক ইউরোপীয় (ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি) এই জেলায় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু বর্তমানে এই জেলায় ইউরোপীয় নাই বললেই চলে।

সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা এই জেলার আদিবাসী নন। তাঁদের অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী বীরভূম বা সাঁওতাল পরগণা

থেকে মাত্র দু-একশ বছর আগে এদেশে আসেন প্রধানতঃ কৃষিকার্যের প্রয়োজনে।

বাগড়ী অঞ্চলের জনবসতি বেশী দিনের নয়। আদিতে কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী প্রভৃতি মানুষ এই অঞ্চলে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মানুষ প্রধানতঃ বর্গীর হাঙ্গামার সময় রাঢ় অঞ্চল ত্যাগ করে এই অঞ্চলে চলে আসেন। অবশ্য মধ্যযুগেও বেশ কিছু এই শ্রেণীর মানুষ বাগড়ী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

প্রাগৈতিহাসিক কাল

প্রাচীনতম নিদর্শন-ফরাক্কা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর নির্মিত বাঁধের ফীডার খালটি (Feeder Canal) কাটার সময় আকস্মিক ভাবে কতকগুলি পোড়ামাটির মাতৃকাদেবীর (Mother Goddess) মূর্তি পাওয়া যায়। এরপর নৌবাহী খাল (Navigation Canal) কাটার সময় গঙ্গা ও গুমানি নদীর সংযোগস্থলে মাটির অনেক নীচে এক নগরের ধ্বংসাবশেষ ও সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন সময়ের নানা রকমের মাটির পাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, নৌকা, তালের ডোঙ্গা, অঙ্কচিহ্(যুক্ত(রৌপ্যমুদ্রা, মেখলা পরিহিত অপ্সরা মূর্তি ও দেবী মূতি, মৌর্য সুঙ্গ যুগের মুদ্রা, গুপ্তযুগের উন্নতমানের মাটির পাত্র প্রভৃতি। এ ছাড়াও সমাধিস্থান এবং নরকঙ্কালও পাওয়া গিয়েছে। এই সব নিদর্শনের অনেকগুলির সঙ্গে বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিতদের মতে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি পরী(া করে জানা যায় 'খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যকায়, মধ্য ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলা দেশের এই (সম্ভবতঃ অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করিত।' (রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃঃ ২০)। সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।' (ঐ পৃঃ২০)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুরাতত্ত্ব অধিকারের ১৯৭৫-এর জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ফরাক্কায় চারটি বিভিন্ন স্তরে বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সর্বনিম্ন অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তরে কতকগুলি মাটির বলয়সমন্বিত কূপ এবং আদিম যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে কতকগুলি বাদামী রঙের মাটির পাত্র পাওয়া যায়। এগুলির সঙ্গেই পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে। এগুলি ব্রোঞ্জ বা তাম্র যুগের সভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করা হয়। তৃতীয় স্তরে পাওয়া যায় উত্তর ভারতের বিখ্যাত কৃষ(বর্ণের মসৃণপাত্র। এর সঙ্গে মৌর্য-সুঙ্গ যুগের ষোলটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ স্তরে পাওয়া যায় কুষাণ ও আদি গুপ্তযুগের নিদর্শন। এই যুগের পোড়ামাটির পাত্রগুলি নলযুক্ত(রোমক মৃৎপাত্রের মত। কয়েকটি সুন্দর শ্বেত-পদ্মের আকৃতির সজ্জাও দেখা যায়। এই সকল নিদর্শন থেকে মনে হয় নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ দিকেই এতদঞ্চলে বসতি স্থাপিত হয়ে ব্রোঞ্জযুগ অতিত্র(ম করে তাম্রযুগে প্রবেশ করে এবং গুপ্তযুগ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় র(িত ফরাক্কায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে বিভিন্ন সময়ের বহু রকমের মৃৎপাত্র, মাতৃকাদেবীর মূর্তি সমেত নানা রকমের মূর্তি, মাটির প্রদীপ, খেলনা, অঙ্কচিহ্(যুক্ত(মুদ্রা (এগুলিতে সূর্য, চৈত্য, জলাশয়, চিতাবাঘ, অশ্ব প্রভৃতির প্রতীক উৎকীর্ণ) প্রভৃতি। এই অঞ্চলে মৌর্যযুগ থেকে প্রথম খ্রীষ্টিয় শতক পর্যন্ত মনুষ্যবসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মঙ্গলকোট, মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত, চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতু গড় প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলির সঙ্গে ফরাক্কায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির প্রবল সাদৃশ্য আছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের নিদর্শন এইগুলি।

এই সব নিদর্শন থেকে ফরাক্কার ঐতিহাসিক গু(ত্ব উপলব্ধি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন আধিকারিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ফরাক্কায় মাটির নীচে প্রাপ্ত নগরটিকে প্রাক্-মৌর্যযুগের বলে অনুমান করেছেন (দি স্টেট্সম্যান ৯.১১.১৯৭৫) এই সকল বিবরণ থেকে ধরে নেওয়া যায় বর্তমান ফরাক্কা থেকে অন্ততঃ অজয় নদের অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলে অন্ততঃ নদীগুলির অববাহিকায় প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বাস ছিল এবং তাঁরা এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলেন।

প্রাচীন যুগ

মৌর্য পূর্ব কাল ঃ রাঢ়া বা রাঢ় দেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনগ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্র'-এ। এই রাঢ়ের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তবে ঐ সময়ের সামগ্রিক ইতিহাসের প্রে(াপটে এই অঞ্চলের ইতিহাস অনুমান করা যায়। ঐ গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে মহাবীর (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) রাঢ় দেশে

ধর্মপ্রচারের জন্য পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু রাঢ় দেশের অধিবাসীরা তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিল। জঙ্গলাকীর্ণ, উষর রূঢ় কঠিন ভূমির অধিবাসীরা ছিল বর্বর (তাদের খাদ্য ও পরিধেয় ছিল নিকৃষ্ট(ভাষা অনার্য ও অবোধ্য। তবে এই রাঢ় দেশ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী-তীরবর্তী সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন রাঢ় দেশ নয়। এ দেশ বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-সাঁওতাল পরগণার অরণ্যসঙ্কুল দেশ বলেই মনে হয়।

জৈনগ্রন্থ অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ় একটি স্বাধীন জনপদ হলেও পরবর্তীকালে এদেশ সম্ভবতঃ মগধের অধিকারভুক্ত(হয়। বিম্বিসার (খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি) অঙ্গদেশের সঙ্গে সম্ভবতঃ রাঢ ও জয় করেন। গ্রীক ও রোমক লেখকদের গ্রন্থ থেকে পূর্ব ভারতে 'প্রাসিই' ও গঙ্গারিডি' নামক দুটি রাষ্ট্রের কথা জানা যায়। পণ্ডিতদের মতে 'প্রাসিই' গঙ্গা অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এবং 'গঙ্গারিডি' গঙ্গার পূর্ব ও উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল সেই সময় যথাত্র(মে প্রাসিই এবং গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত(ছিল। এই দুটি রাজ্য মগধের রাজা মহাপদ্ম নন্দের সময় যুক্ত(হয়ে একটি প্রবল পরাত্র(ান্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রের পরাত্র(মের কথা শুনেই আলেকজান্ডারের সেনাপতিরা পূর্বদিকে আর অগ্রসর হতে চাননি।

মৌর্য যুগ

মহাপদ্ম নন্দকে পরাজিত করে এই রাজ্য মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪ - ৩০০) জয় করেন এবং মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্যদের সময় তৎকালীন রাঢ় ও বাগড়ীর অন্ততঃ মুর্শিদাবাদ জেলার অংশটি তাঁদেরই অধীন ছিল এবং এই সময়েই এ অঞ্চলে আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়(এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

য়ুয়ান-চোয়াং-এর বিবরণে আছে কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল) বুদ্ধদেব (খ্রীঃ পূর্বঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তিনি যে যে স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেই সেই স্থানে রাজা অশোক তাঁর স্মৃতিতে স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই রকম স্তূপের সংখ্যা চারটি। কিন্তু কর্ণসুবর্ণ দূরের কথা,বাংলার কোন অঞ্চলেই যে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বৌদ্ধগ্রন্থগুলি থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মগধ ও সুহ্মের (দ(ি ণ-রাঢ়) মধ্যবর্তী দেশ কজঙ্গলে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং বর্তমান মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা-জঙ্গীপুর অঞ্চলে হয়ত বুদ্ধদেব এসেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ উৎখনন-খ্যাত অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন দাস মনে করেন বুদ্ধদেবের কর্ণসুবর্ণে ধর্মপ্রচারের কথা য়ুয়ান চোয়াং স্থানীয় কিংবদন্তী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন (কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, পৃঃ ১১২)। যাই হোক ঐ জনশ্রুতি থেকেও মনে হয় খুব সম্ভবতঃ এই দেশ অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(ছিল।

মৌর্য পরবর্তীকাল

মৌর্যদের পরবর্তী সময় থেকে গুপ্তরাজত্বের আরম্ভ পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যায় না। এমন কি এই দেশ মৌর্য পরবর্তী সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের রাজাদের অধিকারভুক্ত(ছিল কিনা তাও সঠিক বলা যায় না। ভুবনে(রে কলিঙ্গরাজ খারবেলের হস্তিগুম্ফার শিলালিপি থেকে জানা যায় খারবেল মগধের রাজা বৃহস্পতি মিত্রকে পরাজিত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে খারবেলের এই অভিযান সম্ভবতঃ উৎকল থেকে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল) হয়ে মগধ পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথ ধরেই হয়েছিল এবং এই অঞ্চলও খারবেলের দ্বারা আত্র(ান্ত ও অধিকৃত হয়ে থাকবে।

কুষাণ যুগেও এ অঞ্চলের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। এ অঞ্চল থেকে কুষাণ যুগের কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কেবল মুদ্রাপ্রাপ্তিই কোন অঞ্চলে কারও অধিকার প্রমাণ করে না। অন্যান্য প্রমাণ আবশ্যক এবং বলা বাহুল্য সেই রকম নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি।

রাজবাড়ী ডাঙ্গায় উৎখনন ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর থেকে দশ কিলোমিটার দ(িণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ছি(টি (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) স্টেশনের নিকটে যদুপুর গ্রাম-সংলগ্ন রাজবাড়ী ডাঙ্গায় ব্যাপক খননকার্য হয়। খননকার্য পরিচালনা করেন কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন দাস। তাঁর নেতৃত্বে এখানে ১৯৬২, ১৯৬৪ ও ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে খননকার্য সম্পাদিত হয়। এই খননকার্যের ফলে রাজবাড়ী ডাঙ্গা থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বসতির চিহ্(এবং বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। চারটি স্তরে মোট পাঁচটি পর্বের (Phase) বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বসতি দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের খননকার্যের ফলে পাওয়া যায় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর এক বি(েবিদ্যালয়ের নিদর্শন। শ্রমণ ও ছাত্রদের বাসের জন্য ছয় ফুট বর্গাকৃতি কতকগুলি ক(ও পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত্র(মে উল্লেখ্য সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক

তীর্থযাত্রী তথা পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং বা হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান যে রাজবাড়ীডাঙ্গাতেই ছিল তা এই খননকার্যের ফলে সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রক্ত(মৃত্তিকা বিহারের নির্মাণ কার্য যে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেই আরম্ভ হয় সে বিষয়েও সুনিশ্চিত প্রমাণ এই উৎখননের ফলে পাওয়া গিয়েছে।

গুপ্ত যুগ

গুপ্ত যুগে মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি অংশই গুপ্তদের অধিকারে ছিল একথা অনেকটা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। বাস্তবিক গুপ্তযুগ থেকেই এই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। কারণ এই সময় থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে, অভিলেখ এবং উৎখননে প্রাপ্ত নানাবিধ নিদর্শন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

গুপ্ত রাজাদের আদি বাসস্থান আমাদের সঠিক জানা নাই। এই প্রসঙ্গে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং এর (৬৭৩-৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) একটি বিবরণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ইৎ সিং জানিয়েছেন গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (আঃ ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) পিতামহ শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীদের জন্য নালন্দা থেকে গঙ্গার তীর বরাবর ৪০ যোজন (৩২০ মাইল) দূরে একটি মঠ (বিহার) স্থাপন করে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৪ খানা গ্রাম দান করেন। এই মন্দিরের কাছে মৃগস্থাপন বা মৃগশিখাবন (মি-লি-কিয়া-পো-নো) নামে একটি বিহার ছিল। এই বিহার বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল বলে কথিত। ডঃ ধীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি হিসাব করে বলেছেন, এই বিহার ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। কেবল তাই নয়, তিনি আরও বলেন, গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থানও ছিল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন ঐ মন্দির ও স্তূপ মালদহের নিকট অবস্থিত ছিল। 'সুতরাং মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে বরেন্দ্র অথবা তাহার সমীপবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, পৃঃ ৩৩)। অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন দাস মনে করেন এই স্তূপ কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। (কর্ণসুবর্ণ, পৃঃ ১১৬) তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের আলোচনা থেকে মনে হয় এই মৃগশিখাবন বিহার সম্ভবতঃ মালদহ-ফরাক্কা অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি (আঃ ৩৩৫-৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় সমতট (পূর্ববঙ্গ) একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং ঐ রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছিল। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের পৃথক উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে রাঢ় গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত(ছিল। তবে শুশুনিয়া পাহাড়ের (বাঁকুড়া জেলা) শিলালিপি থেকে জানা যায় পুষ্করণা (পোখর্ণা) বা রাঢ় দেশের অধিপতি ছিলেন চন্দ্রবর্মা। সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য অর্থাৎ রাঢ়দেশ জয় করেন। 'খুব সম্ভবতঃ ইনিই পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা এবং ইহাকে পরাজিত করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দ(িণ বাংলা অধিকার করেন।' (বাংলা দেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪)। যাই হোক রাঢ় (উত্তর ও দ(িণ) দেশ যে গুপ্ত অধিকারে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। দামোদরপুর (দিনাজপুর জেলা) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৮০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহৎ অংশ বিশেষতঃ বাগড়ী অঞ্চল তৎকালীন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি(র অন্তর্গত ছিল। রাঢ় অঞ্চলে গুপ্ত অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায় কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা এবং রাজবাড়ী ডাঙ্গায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের অনেক নিদর্শন থেকে। এ ছাড়াও সালারের কাছে গীতগ্রামে গুপ্তযুগের মুদ্রা এবং মহীপাল অঞ্চলে গৌরীপুরে নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকেই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হয়। হুণবিজয়ী মালবরাজ যশোধর্মা গুপ্তদের পরাজিত করে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পর্যন্ত অভিযান করেন। হুণদের আত্র(মণ ও যশোধর্মার অভিযানের পর দেশে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সেই সুযোগে গুপ্তসাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত রাজারা এবং শাসনকর্তাগণ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন ও (ুদ্র (ুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় পূর্ববঙ্গ ও সমতটে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব রাজত্ব করছিলেন (আঃ ৫২৫- ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই সময় সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ (রাঢ় ও বাগড়ী) এই রাজাদের শাসনাধীন ছিল। কারণ অন্যান্য স্থানের মতই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানেও (মল্লসা(ল) এই রাজাদের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। অধ্যাপক দাস মনে করেন ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ় অঞ্চলে সমতটরাজ বৈণ্যগুপ্তের অধীনে রাজ্যপাল বিজয় সেন শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। (কর্ণসুবর্ণ, পৃঃ ১১৯)

গৌড় রাজ্য ঃ এই সন্ধি(ণেই অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগেই উদ্ভব হয় গৌড় রাজ্যের এবং গৌড়-কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' থেকে 'গৌড়ক' অর্থাৎ গৌড়দেশের (উত্তর রাঢ় এবং সম্ভবতঃ বাগড়ীও) কথা জানা যায়। তবে ঐ সময় গৌড় সম্ভবতঃ শক্তি(শালী রাজ্য ছিল না। মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার হরাহা শিলালিপি (৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় পরাত্র(মশালী গৌড়জন মৌখরী রাজাদের বি(দ্ধাচরণ করেছিল। ঈশানবর্মা

গৌড়জনকে (পরাজিত করে) সমুদ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। সমুদ্রের উল্লেখ থেকে মনে হয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই তখন গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

ঈশানবর্মার গৌড় অভিযানের পর পরবর্তী গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশের উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত সম্ভবতঃ কিছুকালের জন্য হলেও গৌড়দেশ অধিকার করেছিলেন। তিনি কামরূপ-রাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেন। মহারাজ শশাঙ্ক সম্ভবতঃ এই মহাসেনগুপ্তেরই সামন্ত রাজা ছিলেন। ঈশানবর্মা এবং মহাসেনগুপ্তের পর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ জয় করেন। ৫৮১-৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিব্বতের রাজাও মধ্যদেশে অভিযান করেন। এই দুই আত্র(মণের ফলে বঙ্গদেশে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই সুযোগে শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

শশাঙ্ক ঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহারাজ শশাঙ্ক গৌড় রাজ্যকে এক প্রবল পরাত্র(ান্ত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম পরাত্র(ান্ত রাজ্য গৌড়ের অধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বাংলার ইতিহাসে প্রথম সার্বভৌম নরপতি। এই রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ তাঁর সময়েই গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়।

শশাঙ্ক বাংলার ইতিহাসে এক দিগ্বিজয়ী রাজা হলেও তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হঠাৎ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব। রোটাস গড়ে একটি সীলমোহর থেকে জানা যায় শশাঙ্ক একজন মহাসামন্ত ছিলেন ('শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য')। অনেকের মতে তিনি মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশের সন্তান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মগধের সম্রাট মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র বলে অনুমান করেন। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছদ)। এই ধারণার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে খুব সম্ভবতঃ তিনি মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। মহাসেনগুপ্ত ঠিক মগধ না মালবের রাজা ছিলেন তাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে মগধ এবং গৌড় যে তাঁর অধীনেই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাসেনগুপ্তের পর শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি হন। দেবগুপ্ত তখন মালবের রাজা। শশাঙ্ককে কোন কোন (ে ত্রে নরেন্দ্রগুপ্ত এবং নরেন্দ্রাদিত্যও বলা হয়েছে। শশাঙ্ক খণ্ডছিন্ন গৌড় রাজ্যকে একত্রিত ও গৌড়জনকে সুসংবদ্ধ করে স্বাধীন শক্তি(শালী গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই এই সকল কাজ সম্পন্ন হয়।

গৌড়ের অধিপতি হয়েই শশাঙ্ক পূর্বদেশের শক্তি(শালী রাজ্য কামরূপ আত্র(মণ করেন। কামরূপের ভগদত্ত বংশীয় পরাত্র(ান্ত রাজা সুস্থিতবর্মার পুত্রদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা ও ভাস্করবর্মা পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁদের মুক্তি(দিয়ে গৌড়ের অধীনে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ভাস্করবর্মার 'দুবী তাম্রশাসন' থেকে এ কথা জানা যায়। এই বিবরণে গৌড়ের রাজার নাম না থাকলেও তিনি যে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক তা বোঝা যায়। এর আগেও অবশ্য মগধের পরবর্তী গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত কামরূপে অভিযান চালিয়ে সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু মগধের সৈন্যবাহিনী কামরূপ ত্যাগ করলে সুস্থিতবর্মা আবার স্বাধীন ভাবে কামরূপ শাসন করতে থাকেন। এ কথা 'আফসাড় শিলালিপি' থেকে জানা যায়। মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত হিসাবে শশাঙ্কও সম্ভবতঃ ঐ অভিযানে অংশগ্রহণ ও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কামরূপ অভিযানের আগেই যে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ অধিকার করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য । বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গও সম্ভবতও তাঁর অধিকারে আসে। পরে মানরাজাদের পরাজিত করে তিনি দণ্ডভুক্তি((দ(িণ পশ্চিমবঙ্গ) ও উড়িষ্যার কঙ্গোদরাজকে পরাজিত করে কঙ্গোদ রাজ্য অধিকার করেন। কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশের শ্রীমাধবরাজা তাঁর মহাসামন্ত ছিলেন। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উড়িষ্যার চিল্কা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝমাঝি মৌখরীরাজ ঈশানবর্মা গৌড় আত্র(মণ করে গৌড়জনকে বিপর্যস্ত করেন। গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে মৌখরীদের সঙ্গে মগধের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে এসেছে। নিজ শক্তি(বর্ধনের জন্য মহাসেনগুপ্তের পিতা উত্তর ভারতের অপর শক্তি(শালী রাজা থানে(রের (স্থানী(রের) পুষ্প বা পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে কন্যা মহাসেনগুপ্তার বিবাহ দেন। এই দুই দেশের রাজবংশের মধ্যে আত্মীয়তা হওয়ায় কিছুদিন মগধে মৌখরী আত্র(মণ হয়নি। এ দিকে মৌখরীরাজ অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মার সঙ্গে থানে(ররাজ প্রভাকর বর্ধন নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন, ফলে এই দুই রাজ্যের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। তখন মালবের রাজা ছিলেন দেবগুপ্ত। মৌখরীদের শত্রু শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে মৌখরীদের সঙ্গে গুপ্তদের শত্রুতা আবার শু(হয়। ঈশানবর্মার কাছে পরাজয়ের অপমান গৌড়কে অহরহঃ পীড়িত করেছে। তার ফলে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধের জন্য শশাঙ্ক ও দেবগুপ্ত কান্যকুব্জের বি(দ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়।

এর আগেই বারাণসী পর্যন্ত ভূ-ভাগ গৌড়ের অধিকারভুক্ত(হয়েছে। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে দেবগুপ্ত শশাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই কান্যকুব্জ আত্র(মণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন এবং রাজমহিষী রাজ্যশ্রী বন্দী হন। এরপর দেবগুপ্ত থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হলে পথেই প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং দেবগুপ্ত নিহত হন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক কনৌজ অধিকার করেন এবং দেবগুপ্তের সাহায্যের জন্য থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। পথে কনৌজের দিকে অগ্রসরমান রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে সা(াৎ এবং সংঘর্ষ হয়। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এবং হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে বলা হয়েছে শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক আর অগ্রসর হননি। কারণ মৌখরী শক্তি(একেবারেই বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তা ছাড়া হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা যথাত্র(মে উত্তর ও পূর্বদিক থেকে একযোগে আত্র(মণ করতে পারেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেই ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শশাঙ্কের বি(দ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার দূত হংসবেগের সঙ্গে সা(াৎ এবং ভাস্করবর্মার সঙ্গে তাঁর মৈত্রী স্থাপিত হয়। ভাস্করবর্মাও গৌড়ের নিকট পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেন নি। সুতরাং হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি শশাঙ্কের সঙ্গে শত্রুতা করতে এগিয়ে আসেন। হর্ষবর্ধন এবং ভাস্করবর্মার মিলিত শক্তি(কিন্তু শশাঙ্ককে তাঁর জীবিতকালে রাজ্যচ্যুত করতে পারেনি। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু এবং হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহন সম্ভবতঃ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দেই সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় শশাঙ্ক অন্ততঃ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর ভারতের এই দুই পরাত্র(ান্ত শক্তি(র মিলিত অভিযানের বি(দ্ধে শশাঙ্কের প্রতিরোধ তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেয় সন্দেহ নাই। বাংলা (গৌড়-বঙ্গ), উড়িষ্যা, মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার তাঁর অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা এবং সামরিক শক্তি(র পরিচয়।

শশাঙ্কের শেষ জীবন সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা নাই। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ অনুসারে শশাঙ্ক কনৌজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরাদি ধ্বংস, বোধিবৃ(উৎপাটন ও বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করেন এবং এই পাপে তাঁর মৃত্যু হয়। মধ্যযুগের বৌদ্ধ গ্রন্থ 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' অনুসারে এই সকল কার্যের ফলে ভয়ানক কুষ্ঠরোগে আত্র(ান্ত হয়ে তাঁকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। 'কুলপঞ্জিকা'র বিবরণে বলা হয়েছে শাকদ্বীপ থেকে আচার্য ব্রাহ্মণেরা রাজার আমন্ত্রণে কর্ণসুবর্ণে এসে তাঁকে রোগমুক্ত(করেন। অবশ্য এই ঘটনা কতদূর সত্য বলা কঠিন। অন্ততঃ এই ব্যাপার মধ্যদেশ থেকে আসার পরই ঘটেনি। কারণ গঞ্জাম তাম্রশাসন অনুসারে শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং মেদিনীপুরের আর একটি তাম্রশাসন অনুসারে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন তাঁর বুদ্ধগয়ায় আগমনের (৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) কিছু আগে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় ৬২৯ ও ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়, সম্ভবতঃ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

শশাঙ্কের চরিত্র ঃ হিউয়েন সাঙ, বাণভট্ট প্রমুখ ব্যক্তি(গণ শশাঙ্কের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করেছেন। এগুলি (১) বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা এবং (২) বোধিবৃ(উৎপাটন, বৌদ্ধমন্দিরাদি ধ্বংস ইত্যাদি তীব্র বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপ। প্রথম অভিযোগ সূত্রে বাণভট্ট শশাঙ্ককে নীচ, দুষ্ট, পাপী, মুর্খ, 'গৌড়ভুজঙ্গ', 'চণ্ডালেরও অধম' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন ('হর্ষচরিত' ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন এই অভিযোগ ঠিক নয় (History of Ancient Bengal, PP 58-63) তাঁর অভিমত 'সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের পথে শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাস্ত ও নিহত হন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, পৃঃ ৪১) রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও এই মত পোষণ করেন। শশাঙ্কের বি(দ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি চূড়ান্ত বৌদ্ধবিদ্বেষী। তিনি বুদ্ধগয়া ও অন্যত্র অবস্থিত বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসসাধন, বৌদ্ধদের অতি পবিত্র বোধিবৃ(র সমূলে উৎপাটন এবং ঐ স্থানের বুদ্ধমূর্তির অপসারণ প্রভৃতি জঘন্য কাজগুলি করেছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে একটি কথাই বলা বোধ হয় যথেষ্ট যে, যে হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের বি(দ্ধে এই সব জঘন্য অভিযোগ করেছেন, তিনিই শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দেখেছেন, তাঁর রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য বৌদ্ধমন্দির, বিহার, সংঘারাম ইত্যাদি সগৌরবে বিদ্যমান। এমন কি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে দেখেছেন, সম্পূর্ণ সগৌরব বিরাজমান 'রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহার' এবং আরও অন্ততঃ দশটি বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম। আর সেগুলিতে স্বমর্যাদায় বাস করছেন প্রায় চার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ, ভি(প্রভৃতি। (Walters - On Yuan Chowang's Travels in India, Volume II, P - 19)। সুতরাং শশাঙ্কের বি(দ্ধে কোন অভিযোগই ঠিক নয়।

শশাঙ্কের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা ঃ গুপ্ত আমলে দৃঢ়বদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সময় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে। রাজার প্রতি নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করে সামন্তরাজারাই প্রকৃতপ(দেশ শাসন করতেন। শশাঙ্ক গুপ্ত আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে তিনি পদস্থ রাজকর্মচারীদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাসহ সংলগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলে স্বয়ং শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। খুব সম্ভব মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল ও সংলগ্ন বীরভূম জেলার একটি অংশ নিয়ে ঔদুম্বরিক বিষয় গঠিত হয়েছিল, যেটি রাজা স্বয়ং শাসন করতেন। কারণ এই বিষয় কোন ভুক্তি(র অন্তর্গত ছিল না, এবং এর কোন মণ্ডলও ছিল না।

কর্ণসুবর্ণ ঃ শশাঙ্কের রাজত্বকালেই (আনুমানিক ৬০০ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) রাজধানী কর্ণসুবর্ণ সমৃদ্ধি ও গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। মূল কর্ণসুবর্ণ নগরের সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও অজানা। এ যাবৎ যা উৎখনন হয়েছে তা কেবল রাজবাড়ীডাঙ্গায় এবং সেটি রক্ত(মৃত্তিকা বিহারের অবস্থান ভূমি। এই রক্ত(মৃত্তিকা বিহার ছিল কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে। মনে করা হয় মূল কর্ণসুবর্ণ নগর অন্ততঃ তার প্রধান অংশই ভাগীরথীর ভাঙ্গনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ীডাঙ্গার বাইরেও যে বিশাল এলাকায় নানারকম প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভাবনা ছিল অথবা এখনও আছে সেগুলিতে উৎখননের ব্যবস্থা হয়নি। এটা সহজেই বোঝা যায় বহু নিদর্শন হারিয়ে গিয়েছে, এখন উৎখনন হলেও খুব বেশী কিছু হয়ত পাওয়া যাবেনা। তবু প্রাচীন কর্ণুসবর্ণ নগরীর যে অংশ ভাগীরথী গ্রাস করতে পারেনি, সেখানে এখনও কিছু গু(ত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অতি সম্প্রতি 'রা(সী ডাঙ্গা'র নিকটবর্তী চাঁদপাড়া গ্রামে একটি বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

রাজবাড়ীডাঙ্গায় খননকার্যের ফলে চারটি স্তরে মোট পাঁচটি পর্বের বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বসতি চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেকার সময়ের। প্রথম পর্বের বসতি ভাগীরথীর প-াবনে ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বে পাওয়া যায় দেওয়ালের নীচে নরমুণ্ড। নির্মাণকার্যে নরবলি দেওয়া এবং সেই মুণ্ডের উপর ভিত্তি স্থাপনের প্রথা তখনও ছিল। তৃতীয় পর্বে এক বৌদ্ধবিহারের মেঝে ও সিঁড়ি এবং গোলাকার স্তূপের ভিত্তি পাওয়া যায়। এই পর্বেই পাওয়া যায় একটি শস্যভাণ্ডার। সেখানে প্রচুর পোড়া ধান-চাল এবং গম গাওয়া গিয়েছে। কার্বন-পরী(য় জানা যায় এই শস্যভাণ্ডারটি অগ্নিদগ্ধ হয় অষ্টম শতাব্দীতে। তৃতীয় পর্বেই ষষ্ট-সপ্তম শতাব্দীর একটি বিশাল পঞ্চায়তন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমে আরও স্তূপ ও মন্দিরের ভিত্তি ১৯৭৯ সালের খননকার্যের ফলে পাওয়া যায়। আরও পশ্চিমে পাওয়া গিয়েছে ঘরের ভিত্তি, দেওয়াল ও মেঝে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের খননকার্যে ছাত্রদের বাসস্থান সহ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর এক বি(বিদ্যালয় গৃহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ডঃ দাসের মতে এই বিহারের প্রকোষ্টগুলি নালন্দার অপে(া বেশী সুন্দর ও সুনির্মিত।

এছাড়াও আবিষ্কৃত হয়েছে হাতে তৈরী এবং ছাঁচে ঢালা পোড়ামাটির মূর্তি, চুনাবালির তৈরী নানারকমের মূর্তির মুখ, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর তাম্রনির্মিত ধর্মচক্র(, অষ্টম-নবম শতাব্দীর ব্রোঞ্জের বুদ্ধ ও গণেশ মূর্তি প্রভৃতি। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ পোড়ামাটির অজস্র সীলমোহর। এইগুলি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম-নবম শতাব্দীর সময়কালের। এগুলি ছোট, মাঝারি এবং বড় নানা আয়তনের এবং ডিম্বাকৃতি, গোলাকার, চতুষ্কোণ, আয়তাকার প্রভৃতি নানা আকারের। সীলমোহরগুলিতে পদ্ম, বৃ(, মৃগ, প(ী প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনই আছে দুইটি মৃগের মধ্যস্থলে বৌদ্ধ ধর্মচক্র((সারনাথের মৃগদাবে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের স্মারক)। উৎকীর্ণ লিপির অধিকাংশই রক্ত(মৃত্তিকা ভি(সংঘের কার্যসমন্বিত। যেমন 'শ্রী রক্ত(মৃত্তিকা মহা বৈহারিকা ভি(সংঘস্য'। কোন কোনটিতে দেখা যায় 'শ্রী রক্ত(মৃত্তিকা - রাজ মহাবিহার আর্যভি(সংঘস্য'। আবার বৌদ্ধমন্ত্র - সমন্বিত সীলমোহরও আছে। এই সীলমোহরগুলি থেকেই এখানে রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থান সুনিশ্চিত হয়েছে। এখানে বৌদ্ধদেবী বজ্রতারার মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ শশাঙ্কের সময়ে কর্ণসুবর্ণ বৃহৎ ও সমৃদ্ধ নগরী, বিশেষতঃ একটি বিশাল রাজ্যের রাজধানী। সুতরাং সেখানে যে বহুলোকের বসতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সাঙ -এর বিবরণ অনুসারে নগরের পরিধি ছিল ২০ লি অর্থাৎ সাত মাইলের কিছু বেশী। তিনি নগরের লোকসংখ্যা কত ছিল তা জানাননি তবে বলেছেন, নগর ছিল ঘন বসতিপূর্ণ। নগরবাসীরা কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। তারা ছিল শি(িত, শি(ানুরাগী এবং চরিত্রবান এবং যাঁরা জ্ঞান চর্চা করতেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের আচার-ব্যবহার ছিল মার্জিত।

দেশ (হিউয়েন সাঙ -বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্য) ছিল কৃষি প্রধান এবং নানা জাতীয় শস্য এবং ফুল-ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। অপর্যাপ্ত কৃষি সম্পদের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নত ছিল। কেবল কৃষি নয়, শিল্পেও যে দেশ এবং নগর যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল তাও বোঝা যায়। কৃষির কথা বললেও হিউয়েন সাঙ শিল্পের

উল্লেখ করেননি। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুবর্ণকুড্যক অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণে উন্নত মানের রেশম এবং রেশমজাত পত্রোর্ণা বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, (প্রাচীন বাঙলার গৌরব--বি(েভারতী)। উৎখননে প্রাপ্ত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বলা যায় দেশে অন্ততঃ শশাঙ্কের সময়ে এবং তার আগে শিল্পের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কর্ণসুবর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। স্থলপথে দেশের তৎকালীন গু(ত্বপূর্ণ নগরগুলির সঙ্গে সংযোগ ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে, অন্যদিকে তেমনই তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্তের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তখন ভাগীরথী সমুদ্রগামী জলযানের প(ে ও নাব্য ছিল। বুদ্ধগুপ্তের মালয়েশিয়ার শিলালিপি (আঃ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ) থেকে প্রমাণিত যে কর্ণসুবর্ণ অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দীতেই বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। রাজবাড়ী ডাঙ্গার উৎখননে একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এই সীলমোহরটিতে সমুদ্রযাত্রা এবং নৌযাত্রার অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবীর নাম উৎকীর্ণ আছে। এ থেকে গ্রীক নাবিক ও বণিকদের সঙ্গে কর্ণসুবর্ণের সম্পর্ক বোঝা যায়। (কর্ণসুবর্ণ, পৃঃ ১৬৫)। উন্নত ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় শশাঙ্ক প্রবর্তিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলনে। শশাঙ্কের মুদ্রা গুপ্তযুগের মুদ্রারই অনুসারী। তবে প্রথম দিকের মুদ্রায় সোনার পরিমাণ যতটা ছিল, পরবর্তীকালে সেই পরিমাণ সোনা মুদ্রায় ছিল না। মুদ্রায় বেশী খাদ থাকার জন্য মনে করা হয় শশাঙ্কের শাসনের শেষ দিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। অবশ্য বহির্বাণিজ্যে ধাতুমুদ্রা ব্যবহৃত হলেও দেশের মধ্যে প্রধানতঃ কড়ির মাধ্যমেই ত্র(য়-বিত্র(য় সম্পন্ন হত।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ শশাঙ্ক নিজে শৈব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তাঁর দানপত্রের লেখ অনুসারে তিনি পরমদৈবত (দেবভক্ত(), পরমভট্টারক (পণ্ডিত) এবং পরম মাহে(রের (মহে(রের ভক্ত() ছিলেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও দেশের সর্বত্র হিন্দুমন্দিরাদি অবস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি অবশ্যই বেশী ছিল। হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে পঞ্চাশটিরও বেশী দেবমন্দির দেখেছিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের আমলে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রভাব ও সমৃদ্ধি কম ছিল না। হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্যের সর্বত্র বহু বৌদ্ধমন্দির, বিহার, স্তূপ, সংঘারাম প্রভৃতি দেখেছেন। রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে যে বিশাল রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহার অবস্থিত ছিল তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই সংঘারামেই ধর্মালোচনার জন্য বিত্তশালী ও বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর নিয়মিত সমাবেশ হ'ত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন কর্ণসুবর্ণে অশোক চারটি স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। একটি ছিল রক্ত(মৃত্তিকা বিহারের কাছেই। এ ছাড়াও দশটি সংঘারাম ও দুই (মতান্তরে চার) হাজার শ্রমণ এবং দেবদত্তের শিষ্যদের তিনটি সংঘারামও তিনি দেখেছিলেন। শ্রমণ ও ভি(রা সকলেই ছিলেন হীনযান সম্প্রদায়ের 'সম্মতীয়' শ্রেণীভুক্ত(। কর্ণসুবর্ণে তিনি কোন জৈনমন্দির বা জৈন ধর্মাবলম্বীর উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পুণ্ড্রবর্ধনে তিনি বহু জৈন সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। নগরে সকল ধর্মের লোক শান্তিতে বাস করত। (On Yuan - chowang's Travels, Vol.II) এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায় শশাঙ্কের উগ্র বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষ এবং তাঁর দ্বারা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার ও বৌদ্ধমন্দিরাদি ধ্বংস ইত্যাদির অভিযোগ সর্বতোভাবে সত্য নয়। রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহার সেকালে বিদ্যাশি(ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল এবং উৎখননেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শশাঙ্কের পরবর্তীকাল ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' অনুসারে শশাঙ্কের পুত্র মানব শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাত্র আট মাস পাঁচদিন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর দেশে নানারকম বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা নেমে আসে। 'মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' পরবর্তী-কালের রচনা এবং খুব প্রামাণ্য গ্রন্থও নয়। তবে এটা ঠিক যে শশাঙ্কের পর তাঁর বিশাল রাজ্য পরিচালনা ও শাসন করার মত কোন যোগ্য ব্যক্তি(ছিলেন না। একদিকে হর্ষবর্ধন ও অন্যদিকে ভাস্করবর্মা — এই দুই প্রবল মিলিত শক্তি(র বি(দ্ধে সেই সময়কার দুর্বল শাসকের প(ে একে র(া করার উপায় ছিল না। অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকর্তা বা সামন্তরাজগণ স্ব-স্ব স্থানে স্বাধীন ভাবে শাসন করতে থাকায় এবং পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই শশাঙ্কের বিশাল গৌড় রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। তিনি গৌড় রাজ্যের কথা বলেন নি। পূর্বতন গৌড় রাজ্যের জায়গায় তিনি চম্পা, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণের কথা লিখেছেন। শেষ চারটি রাজ্য বাংলায়। এই সব দেশের মধ্যে কেবল সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের উল্লেখ করেছেন। অন্য দেশগুলির কোন রাজার উল্লেখ না থাকায় অনেকে মনে করেন যে এই খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না, সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত(ছিল। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের জীবিতকালে তাঁর রাজ্য জয় করতে পারেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য হর্ষের অধিকারভুক্ত(হয়।

ভাস্করবর্মা ঃ কারও কারও মতে হর্ষবর্ধনের আগে ভাস্করবর্মাই কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। হিউয়েন সাঙ -এর জীবন চরিত অনুসারে হর্ষবর্ধন ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত এবং শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত(কোঙ্গদ রাজ্য জয় করে ফিরবার পথে কজঙ্গলের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করেন। সেখানে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে তাঁর সা(াৎ হয়। এই সময় কর্ণসুবর্ণ সম্ভবতঃ ভাস্করবর্মার অধিকারে ছিল। তিনি বিশ হাজার রণহস্তী এবং গঙ্গাব(দিয়ে ত্রিশ হাজার রণপোত নিয়ে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সা(াৎ করেন। তবে ভাস্করবর্মা যে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'নিধনপুর তাম্রশাসন' থেকে জানা যায় ভাস্করবর্মা কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এই দানপত্র দেওয়া হয়েছিল কর্ণসুবর্ণ 'জয়স্কন্ধাবার' থেকে। এ থেকে মনে করা হয় ভাস্করবর্মা স্থায়ীভাবে কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করেন নি, বা তাঁর অধিকারও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

জয়নাগ ঃ জয়নাগ সম্ভবতঃ ভাস্করবর্মার পর কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। জয়নাগের 'বপ্পঘোষবাট তাম্রশাসন'-এ রাজা জনৈক ব্রহ্মবীরস্বামীকে ভূমিদান করেছিলেন। এই তাম্রশাসনও দেওয়া হয় কর্ণসুবর্ণ থেকে। বপ্পঘোষবাট ঔদম্বরিক বিষয়ের অন্তর্গত। বীরভূম জেলার অধিকাংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল এই বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত(ছিল। বপ্পঘোষবাট মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়। (Dt. Gazetteers, 1979)। জয়নাগের মহারাজাধিরাজ উপাধি এবং তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে বোঝা যায় তিনি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি কবে এবং কতদিন রাজত্ব করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কেউ কেউ তাঁকে শশাঙ্কের পূর্ববর্তী রাজা বলেও মনে করেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে জয়নাগ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন।

মাৎস্যন্যায় ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট হয় এবং সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল প্রভৃতি অঞ্চলে সামন্ত রাজগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন। রাত, খড়্গ, দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ পূর্ব ও দ(িণ-পূর্ব বঙ্গে কিছুকাল রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় একশ বছর দেশে ভয়াবহ অরাজকতা এবং চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। ইতিহাসে এই অবস্থা 'মাৎস্যন্যায়' বলে অভিহিত। আ(রিক অর্থে মাৎস্যন্যায়ের অর্থ — বড় বড় মাছ যেমন ছোট ছোট মাছকে গ্রাস করে, তেমনই প্রবল ও পরাত্র(মশালী ব্যক্তি(রা দুর্বল ও অসহায় মানুষের উপর স্বেচ্ছামত উৎপীড়ন করে। আইনের কোন শাসন থাকে না। লামা তারনাথের বিবরণে মাৎস্যন্যায়ের যে চিত্র পাওয়া যায় তা রীতিমত ভয়ানক। 'গৌরবঙ্গে তখন আর কোন রাজার আধিপত্য, সর্বময় রাষ্ট্রীয় প্রভূত্ব তো নাই-ই। রাষ্ট্র ছিল বিচ্ছিন্ন, (ত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই প্রধান। আজ এক জন রাজা হইতেছেন, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবী করিতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে নৈরাজ্যের বাস্তবচিত্র আর কি হইতে পারে?' (বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫)। এরপর দেশের 'প্রকৃতি-পুঞ্জ' অর্থাৎ (মতাশালী সামন্ত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি(গণ অতিষ্ঠ হয়ে সর্বসম্মতিত্র(মে গোপালকে দেশের রাজা নির্বাচিত করেন। পালযুগের সূচনা হয়।

শতবর্ষব্যাপী (খ্রীষ্টাব্দ ৬৫০-৭৫০) মাৎস্যন্যায়ের কালে দেশে একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরস্পর আত্র(মণ এবং অত্যাচার, অরাজকতা অব্যাহতভাবে চলেছে, অপরদিকে এই সময় বৈদেশিক আত্র(মণও কম হয়নি। তিব্বতের রাজা এবং পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণ গৌড় অধিকার করেন বলে অনেকে মনে করেন। এই ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ ৭২৫-৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কনৌজের রাজা যশোধর্মা গৌড় অধিকার করেন এবং গৌড়ের রাজাকে বধ করেন। যশোধর্মার সভাকবি বাক্‌পতিরাজ এই ঘটনা উপল('গৌড়বহো' অর্থাৎ 'গৌড়বধ' নামক কাব্য রচনা করেন। এরপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যশোধর্মাকে পরাজিত করেন এবং দিগ্বিজয়কালে গৌড় রাজ্যও অধিকার করেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কাব্য কহলনের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে জানা যায় কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু গৌড়রাজ কাশ্মীরে গেলে তাঁকে বি(াসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কতিপয় গৌড়বাসী তীর্থ যাত্রার ছলে কাশ্মীরে যান, কিন্তু সেখানে কাশ্মীরের সৈন্যদের দ্বারা তাঁরা নিহত হন। কহলন এই গৌড়বাসীদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করেছেন।

হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে (৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দেশে অরাজকতার চিহ্(দেখেন নি। বরং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধির প্রশংসা করে গিয়েছেন। মাৎস্যন্যায়ের ভয়ঙ্কর অরাজকতা আরও পরের ব্যাপার, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর। যাইহোক এই শত বৎসরের অরাজকতায় দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি সবকিছুই চরম বিপর্যয়ের কবলে পড়ে। কর্ণসুবর্ণ তথা গৌড়ের অসাধারণ সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

পাল রাজত্ব

পাল রাজত্বকাল বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাসে এক অতীব

গৌরবময় কাল। এই আমলকে যে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয় তা সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই বলা হয়ে থাকে। পালরাজারা আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত সুদীর্ঘ চারশ বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব করেন। তাঁদের সময়েই সর্বপ্রথম বাঙালীর জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ও জাতীয় চেতনা এবং সর্বভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বাঙালীর ইতিহাসে পূর্বে বা পরে এমন গৌরবের দিন আর কখনও আসেনি। পালরাজত্বের সূত্রপাতও সমান গৌরবের। বাংলার এক চরম দুঃসময়ে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এক শতাব্দীকালের ভয়াবহ 'মাৎস্যন্যায়ের' পর প্রকৃতি-পুঞ্জ অর্থাৎ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত ও প্রধানগণের শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং তাঁরা সমবেতভাবে তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও অভিজ্ঞ প্রশাসক গোপালদেবকে তাঁদের অধিরাজ নির্বাচিত করেন। এই অসাধারণ ঘটনা ঘটে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, পরাত্র(ান্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর একশ বছর পরে। এই ঘটনা বাংলা ও বাঙালীকে চরম বিপর্যয়ের, এমনি সম্ভাব্য অবলুপ্তির হাত থেকে র(া করে। (ডঃ নীহাররঞ্জন রায় — বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১ম)।

পাল রাজত্বের সং(িপ্ত ইতিহাস ঃ 'রামচরিত' অনুসারে পাল রাজাদের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ এবং যতদূর জানা যায় তাঁরা ছিলেন সাধারণ লোক। তাঁরা ব্রাহ্মণ, (ত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোক ছিলেন না, যদিও পরে তাঁরা (ত্রিয় বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। গোপালদেব সম্ভবতঃ রাঢ় ও বঙ্গেরই (পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ) রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তিনি উত্তরবঙ্গসহ আরও অনেক অঞ্চল তাঁর রাজ্যভূক্ত(করেন।

ধর্মপাল ঃ গোপালের সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) উড়িষ্যা এবং নর্মদার দ(িণের রাজ্য সমেত সমগ্র উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর ভারত জয় করে বিশাল পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেবল দিগ্বিজয় করেই (ান্ত থাকেন নি, বিত্র(মশীলা, পাহাড়পুর, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিহার ও বি(বিদ্যালয়, অসংখ্য মন্দির ও ধর্মস্থান প্রভৃতি নির্মাণ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের সুযোগ্য পুত্র দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পিতার বিশাল সাম্রাজ্য কেবল র(াই করেন নি, তাঁকে বিস্তৃতও করেছিলেন। তাঁর আমলেই পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরমসীমায় উপনীত হয়। আসাম থেকে কাম্বোজ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে। তাঁর বিজয়বাহিনী পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, উত্তরে হিমালয় থেকে দ(িণে বিন্ধ্যপর্বত এবং সম্ভবতঃ ভারতের দ(িণতম প্রান্ত পর্যন্ত উপনীত হয়। তাঁর নাম ও যশ ভারতের বাইরেও পৌঁছায় এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব তাঁর রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন।

বিগ্রহপাল ঃ কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর যখন প্রথম বিগ্রহপাল অথবা শূরপাল রাজা হন তখন থেকেই পালসাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। বিগ্রহপাল ছিলেন সম্ভবতঃ ধর্মপালের পৌত্র এবং দেবপালের ভ্রাতা ও সেনাপতি বাক্পালের পুত্র। এ যাবৎ ঐতিহাসিকগণ দেবপালের পরবর্তী রাজা হিসাবে বিগ্রহ পাল অথবা শূরপালকেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলার জগজীবনপুরে মহেন্দ্রপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই মূল্যবান তাম্রশাসন থেকে জানা যায় দেবপালের পুত্র ছিলেন মহেন্দ্রপাল। এর আগে এই মহেন্দ্রপালকে গুর্জর প্রতিহার বংশের প্রথম মহেন্দ্রপাল বলে মনে করা হত। জগজীবনপুরের তাম্রশাসন থেকে বোঝা গেল মহেন্দ্রপাল পালবংশের রাজা এবং তিনি কমপ(ে ১৫ বছর রাজত্ব করেন। এই রাজার পরে তাঁর ছোট ভাই (জগজীবনপুর তাম্রশাসনে এঁকে দূতক বলা হয়েছে) রাজত্ব করেন। (দেবলা মিত্র, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, 'মালদহ জেলার পুরাকীর্তি', ১৯৯৭)। বলা বাহুল্য এই আবিষ্কারের পর দেবপালের উত্তরাধিকারীর নাম নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ নীহাররঞ্জন লিখেছেন দেবপালের পুত্র থাকা সত্ত্বেও প্রধানত পারিবারিক গন্ডগোলে তিনি রাজা হতে পারেন নি। কিন্তু রমেশচন্দ্রের মতে দেবপালের পর তাঁর পুত্র শূরপাল সিংহাসনে বসেন। তবে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পিতৃব্য সেনাপতি জয়পাল নিজপুত্র বিগ্রহপালকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা শূরপালের পুত্র না থাকায় বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, পৃঃ ৭৫-৭৬)। এখন জগজীবনপুরের তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহেন্দ্রপাল এবং শূরপাল হয়ত একই ব্যক্তি(। মহেন্দ্রপাল ১৫ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা বিগ্রহপাল (তাম্রশাসনে যাঁকে দূতক বলা হয়েছে) রাজা হন।

যাই হোক এই সময় একদিকে পুনঃ পুনঃ বহিরাত্র(মণ ও অপরদিকে সম্ভবতঃ রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিশাল পালসাম্রাজ্য ত্র(মশঃ ীণ থেকে ীণতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতের একটি অকিঞ্চিৎকর রাজনৈতিক শক্তি(রূপে পরিগণিত হয়। বহিরাত্র(মণ ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ও বহুবার হয়েছে — বিশেষ করে উত্তরের প্রতিহার এবং দ(িণের রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা — কিন্তু ধর্মপাল ও দেবপালের বাহুবলের

কাছে তা ব্যর্থ হয়। অবশ্য ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তাঁর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হলেও তিনি সৌভাগ্যত্র(মে সেই দুর্যোগকে কাটিয়ে ওঠেন। কিন্তু দেবপালের পর পাল রাজগণ বিশাল পালসাম্রাজ্যকে র(া করতে পারেন নি। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণ পাল আনুমানিক ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপাল (আঃ ৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ও রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আঃ ৯৪০-৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আঃ ৯৬০-৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন শক্তি(শালী রাজ্য প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট ছাড়াও আরও নানাদিক থেকে ত্র(মাগতঃ আত্র(মণের ফলে পালরাজত্বের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয় ও শেষ পর্যন্ত দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বিশাল পাল সাম্রাজ্য কেবল অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বরেন্দ্র, বঙ্গ ও রাঢ় দেশে পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

মহীপাল ঃ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল (আঃ ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বিশাল পাল সাম্রাজ্যের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই। মগধের কিয়দংশ, অঙ্গ ও সংলগ্ন উত্তর রাঢ়ের কিছুটা অংশের মধ্যেই সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল তখনকার পাল রাজ্য। কিন্তু স্বীয় বাহুবল, কর্মদ(তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সাহায্যে তিনি হৃত সাম্রাজ্যের বহু অংশই পুন(দ্ধার করেন। তিনি একে একে সমগ্র বাংলা, কামরূপ ও উড়িষ্যা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(করেন। তাঁর প্রভুত্ব উত্তর-পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে এ জন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয়েছিল এবং বহু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। বস্তুতঃ পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুরোপুরি না হলেও বহুল পরিমাণে আবার ফিরে আসে।

মহীপালনগর ঃ শশাঙ্কের গৌড় রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, কিন্তু পালরাজাদের শাসনকেন্দ্র ঠিক কোথায় ছিল জানা যায় না। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, পাল রাজাদের একটির বদলে অনেকগুলি শাসন কেন্দ্র ছিল। মহীপালের সময় পাল রাজধানী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় (তদানীন্তন উত্তর রাঢ়) মহীপালনগরে ছিল বলে মনে হয়। যদিও একথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। মহীপাল সাগরদীঘি থানায় অন্তর্গত একটি (দ্র গ্রাম (মৌজা নং ১৬১)। কিন্তু এক সময় এই মহীপাল অঞ্চল যে এক বিশাল নগর ছিল তার অজস্র নিদর্শন বর্তমান। পূর্ব-পশ্চিমে আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলপথে বাড়ালা-সাহাপুর থেকে শু(করে ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া রেলপথে মহীপাল রোড স্টেশন হয়ে ভাগীরথী তীরে গিয়াসাবাদ পর্যন্ত এবং উত্তরে বালাগাছি-চামুণ্ডা-নওপাড়া থেকে দ(িণে মাহীনগর (বর্তমান মহীনগর, জিয়াগঞ্জ থানা) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাচীন মহীপালনগরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। ১৯৫১-এর জেলা জনগণনার বিবরণী (Dt. Census Handbook, 1951) অনুসারে এই নগরের পরিধি ছিল ত্রিশ মাইল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল প্রাচীন দীঘি, ছোট বড় প্রস্তরস্তম্ভ, স্তম্ভের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য প্রস্তরখণ্ড। অনেকগুলিই নানারকম কা(কার্য-সমন্বিত। মহীপাল রোড স্টেশনের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে উঁচু ডাঙ্গাটিতে অজস্র প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড ছড়ানো আছে। মাটির নীচেও এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এটি যে কোন হর্ম্য অথবা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তা বোঝা যায়। এই অঞ্চল থেকেই ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পেয়েছিলেন। এখান থেকে তিনি স্বর্ণমুদ্রাও সংগ্রহ করেছিলেন। জিয়াগঞ্জের প্রসিদ্ধ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ কর্তৃক বহু প্রত্নসামগ্রী এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সংগ্রহের মধ্যে একখণ্ড পাথরে ব্রাহ্মী অ(রে (োদিত একছত্র লিপিও আছে। লিপিটি সপ্তম শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। কিছুদিন আগে লক্ষ্মীহাটে মাটি কাটার সময় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের (আঃ ৫১৫-৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ) স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। লিপিটি জিয়াগঞ্জ সংগ্রহশালায় এবং মুদ্রা রাজ্য পুরাতত্ত্ব-বিভাগের সংগ্রহশালায় র(িত আছে বলে জানা যায়। এই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় মহীপাল প্রাচীনকালে একটি বিশিষ্ট নগর ছিল। যে সকল বিশেষ কারণে মহীপালকে পালরাজ্যের রাজধানী বলে মনে করা হয় সেগুলি প্রধানতঃ — (১) স্থানটির নামকরণ — যেমন মহীপাল, মহীনগর, রামপাল, রাজারামপুর প্রভৃতি গ্রাম। (২) স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান - পূর্বদিকে ভাগীরথী, উত্তরে ও উত্তরপূর্বে ভাগীরথীর একটি শাখা ও উপনদী মহানালা অথবা মহীনালা এবং বালাগাছি বিলের বিস্তৃত জলাভূমি, দ(িণে ভাগীরথীর আর একটি উপনদী 'ভোমরা' এবং একটি দীর্ঘ গভীর খাত। কেবল পশ্চিম দিক উন্মুক্ত(এবং স্থলপথে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত(। সমগ্র অঞ্চলটি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সুর(িত। (৩) অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, (৪) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

সাগরদীঘি ঃ মহীপাল রোড স্টেশনের দশ কিলোমিটার পশ্চিমে সাগরদীঘি মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তম দীঘি। পালরাজা মহীপাল এই দীঘি কাটান বলে প্রসিদ্ধি। মনে হয়, এই বিশাল দীঘি মূলতঃ সামরিক প্রয়োজনে কাটানো হয়েছিল, অর্থাৎ এই দীঘির নিকটে পালরাজাদের সেনানিবাস ছিল এবং সৈন্যদের প্রয়োজনেই এত বড় দীঘি কাটানো হয়েছিল (অথবা কোন সার্থক

বিজয় অভিযানে বা যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবেও এ দীঘি কাটানো হতে পারে। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্রাট ধর্মপালের ভূমিদান সংক্র(ান্ত একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৪ মার্চ, ১৯৯২)। সামরিক প্রয়োজনে দীঘি কাটানো হয়ে থাকলে এখানে রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র থাকার কথা এবং সে (ে ত্রে মহীপালের রাজধানীর নিকটে হওয়ায় মহীপালই এই দীঘি কাটান বলে মনে করা যায়। আর যদি যুদ্ধ জয় বা ঐ রকম কোন স্মরণীয় ঘটনা উপল(ে কাটানো হয়ে থাকে তবে ধর্মপালের দ্বারাও এই দীঘি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে। সম্প্রতি দীঘির মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি বিশাল স্তম্ভের (জয়স্তম্ভ?) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। স্তম্ভটি মাঝখানে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য দীঘির জল খুব কমে না গেলে স্তম্ভটি দেখা যায় না। তবে দীঘি যে পালরাজাদেরই কীর্তি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

মহীপাল যখন সিংহাসনে বসেন তখন পাল আমলের বড়ই দুর্দিন। মগধ ও অঙ্গ সংলগ্ন উত্তর রাঢ়ের কিয়দংশ ছাড়া সম্ভবতঃ বিশাল সাম্রাজ্যের সবটাই তাঁদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং উপর্যুপরি বহিঃশত্রুর আক্র(মণে পাল-গৌরবের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই মহীপালকে উত্তর রাঢ়েই আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ এই মহীপাল নগরেই শাসনকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়েছিল। মহীপালের সময়ে অনেক বহিরাক্র(মণ হয়েছে। তার মধ্যে দ(িণাত্যের প্রবল পরাক্র(ান্ত রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২০-১০২৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ উত্তর-পূর্ব ভারতে এক সমরাভিযান প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনী দণ্ডভুক্তি(('তণ্ডভুক্তি('), দ(িণ রাঢ় ('তক্কণ লাঢ়ম') এবং বঙ্গদেশের রাজাদের পরাজিত করে উত্তর রাঢ়ের ('উত্তির লাঢ়ম') রাজা মহীপালকে পরাজিত ও তাঁর রাজ্য লুণ্ঠন করে। মহীপাল যুদ্ধ(ে ত্র থেকে পলায়ন করেন। রাজেন্দ্র চোলের 'তি(মালয়' অভিলেখে এই সব ঘটনার উল্লেখ আছে। ল(্য করার বিষয় এখানে মহীপালকে উত্তর রাঢ়ের রাজা বলা হয়েছে। মহীপালের রাজত্বকালের শেষদিকে কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয় দেব তাঁর রাজ্য আক্র(মণ করেন এবং বারাণসী অধিকার করেন (খ্রীষ্টাব্দ ১০৩৪)।

মহীপালের পরবর্তী পালরাজগণ ঃ মহীপাল পরাক্র(ান্ত রাজা ছিলেন এবং পঞ্চাশ বছর অত্যন্ত দ(তার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। বহু জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুর্বল বংশধরেরা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল (১০৩৮-১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা হন। তাঁর সময়ে কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়। কর্ণ মগধ অধিকার ও লুণ্ঠন করলেও তাঁর রাজধানী অধিকার করতে পারেন নি। অবশ্য প্রখ্যাত আচার্য অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

দীপঙ্কর তিব্বতে যাত্রা করার পর নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় (আঃ ১০৫৪-৭২ খ্রীষ্টাব্দ) কর্ণ আবার আক্র(মণ করেন। কর্ণ সম্ভবতঃ বর্তমান বীরভূম জেলার পাইকর পর্যন্ত অগ্রসর হন। শেষ পর্যন্ত কর্ণ সম্ভবতঃ পরাজিত হন এবং এই দুই প(ে সন্ধি স্থাপিত হয়। অবশ্য দুই প(ই একে অপরকে পরাজিত করেন বলে দাবী করেছেন। কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহপালের বিবাহ হয়। পাইকরে একটি ভগ্ন স্তম্ভগাত্রে কর্ণের একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। ঐ লিপি অনুসারে কর্ণ একটি দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মূর্তিপ্রতিষ্ঠা রাজা কর্ণের যুদ্ধজয়ের স্মারক বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার অন্যেরা মনে করেন এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠা দ্বারা কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

বিগ্রহপালের রাজত্ব কালেই পালরাজশক্তি(দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার নানা অঞ্চলে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। মহামাণ্ডলিক ঈ(ের ঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপন করে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক (ুদ্র (ুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিগ্রহপালের মৃত্যুকালেই বৈদেশিক আক্র(মণ এবং অন্তর্বিপ্-বে এইভাবে পালরাজ্য একেবারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (আঃ ১০৭২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা হয়ে কনিষ্ঠ দুই ভাই শূরপাল ও রামপালকে কারা(দ্ধ করেন। তাঁর সময়ে বরেন্দ্রের সামন্ত রাজারা বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মহীপাল নিহত হন। বিদ্রোহী নায়ক দিব্য বা দিব্বোক বরেন্দ্র অধিকার করেন। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই (দোক এবং (দোকের পর তাঁর পুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজা হন। দিনাজপুরের 'কৈবর্ত-স্তম্ভ' কৈবর্ত রাজাদের কীর্তির স্মারক।

রামপাল ঃ দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর কারাগার থেকে মুক্ত(হয়ে দ্বিতীয় শূরপাল অল্পদিনের জন্য রাজা হন (আঃ ১০৭৫-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তারপর সিংহাসনে বসেন রামপাল (আঃ ১০৭৭-১১৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। রামপালের সিংহাসনে আরোহণের সময় পাল রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দিন। রাজ্যের প্রায় সবটাই তখন হাত ছাড়া। উত্তর রাঢ়ের সামান্য কিছু অংশ এবং বঙ্গের অংশবিশেষ ছিল তাঁর অধিকারে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগটিতেই অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের বাগড়ী

অঞ্চলেই তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী কৈবর্ত রাজারা রাজত্ব করছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তগণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করছিলেন। রামপাল সম্ভবতঃ মহীপালের অপর পাড়ে (ভাগীরথীর পূর্বপাড়) 'রামপালে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামপালের সামান্য উত্তরে রাজারামপুর (লালগোলা থানা) গ্রামটিও রামপালের স্মৃতি বিজড়িত। রামপাল দীর্ঘদিন ধরে সামন্ত রাজাদের কাছে গিয়ে তাঁদের সাহায্য ভি(া করেন এবং বিপুল অর্থ ও ভূমির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সাহায্য লাভ করেন।

রামপাল যে সকল রাজা বা সামন্তগণের সাহায্য লাভ করেছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্যে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এই সব রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে দেখা যাবে সেগুলি সবই বাংলা বা পার্শ্ববর্তী অবিভক্ত(বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। এই সব রাজাদের মধ্যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার সন্নিকটে কয়েকজনের রাজ্য অবস্থিত ছিল। এমন কি জেলার বেশ কিছু অংশও সম্ভবতঃ এই সব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। এঁরা হলেন (১) উচ্ছলাধিপতি (বীরভূম জেলার জৈন উঝিয়াল পরগণা) ভাস্কর বা ময়গল সিংহ। (২) কজঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জুন। 'কজঙ্গল বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় রাজমহল অঞ্চল'। কজঙ্গল মণ্ডলে সেই সময় উত্তর রাঢ়ের কিছুটা অংশ অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ থানার অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত(ছিল বলে মনে করা হয় (Dt. Gazetters, 1979). (৩) ঢেক্করীর রাজা প্রতাপ সিংহ। ঢেক্করী বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানায় অজয় নদের দ(িণ তীরে অবস্থিত 'ঢেকারগড়' নামক স্থানে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। (অ(য় কুমার মৈত্রেয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রমেশচন্দ্র মজুমদার) ঢেক্করীর রাজা ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষের নাম তাম্রশাসন এবং মঙ্গল কাব্যেও পাওয়া যায়। ঐ সময় সম্ভবতঃ জেলার ভরতপুর অঞ্চল ঢেক্করীর অন্তর্ভুক্ত(ছিল (Dt. Gazetteers, 1979) নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ। (৪) বালবলভীর রাজা বিত্র(মরাজ। বালবলভীকে কেউ কেউ বলেন মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম-দ(িণ সীমান্ত অঞ্চলে। আবার কারও মতে নদীয়া জেলার দেবগ্রাম অঞ্চল। রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সুধীর রঞ্জন দাস দেবগ্রামকেই সমর্থন করেন (পৃঃ ১১৩, এবং পৃঃ ২০৯)। বালবলভী দেবগ্রাম হলে মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ী অঞ্চলের (ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল) কিছুটা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(হওয়া সম্ভব।

এইভাবে সৈন্য ও শক্তি(সংগ্রহ করে রামপাল মাতুল রাষ্ট্রকূট রাজ মথনদেব বা মহনদেব ও মাতুল পুত্রদ্বয় কাহ(রদেব ও সুবর্ণদেব এবং মথনদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজদেবের সহায়তায় নৌসেতুযোগে পদ্মা পার হয়ে কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাস্ত ও নিহত করে বরেন্দ্র পুনরায় অধিকার করেন। এইভাবে পিতৃভূমি ('জনকভূঃ') বরেন্দ্র বা উত্তর বঙ্গ জয় করে রামপাল সেখানে রামাবতী নগর (বর্তমান মালদহ জেলায়) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

রামপাল কামরূপ ও কলিঙ্গও জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত(করেন। তার আগেই দ(িণবঙ্গ তাঁর অধিকারে আসে। রামপাল তাঁদের হৃত সাম্রাজ্যের অনেকটাই তাঁর রাজ্যভুক্ত(করতে সমর্থ হন।

পাল রাজত্বের অবসান ঃ রামপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁর মাতুল মথনদেবের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি মুদগগিরিতে (বর্তমান মুঙ্গের) গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জন করেন। তারপর তাঁর পুত্র কুমারপাল (আঃ ১১৩০-১১৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ও কুমারপালের পুত্র তৃতীয় গোপাল (আঃ ১১৪০-১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা হন। তৃতীয় গোপালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মদনপাল (আঃ ১১৪৪-১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজপদে অভিষিক্ত(হন। তাঁর সময়েই পাল রাজত্ব অবলুপ্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যায় এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালরাজত্ব একেবার বিলুপ্ত হয়ে যায়। ত্র(মাগত বহিরাত্র(মণ এবং তীব্র অন্তর্কলহই পালরাজত্বের দ্রুত অবলুপ্তির কারণ বলে মনে করা হয়।

পাল আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার শাসন ব্যবস্থা ঃ গুপ্ত আমলের মতই পাল আমলেও রাজ্য ভুক্তি(, বিষয়, মণ্ডল এবং বীথিতে বিভক্ত(ছিল। ভুক্তি(এখনকার বিভাগ, বিষয় বা মণ্ডল জেলা এবং বীথি সম্ভবতঃ অঞ্চল। ভুক্তি(র প্রধান ছিলেন ভুক্তি(পতি, বিষয়ের বিষয়পতি, মণ্ডলের মাণ্ডলিক বা মহামাণ্ডলিক, কিন্তু বীথির প্রধানের কোন পদের নাম পাওয়া যায় না। পাল আমলের বাংলায় প্রাপ্ত লিপিগুলিতে বীথির উল্লেখ নাই তবে বিহার অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিতে আছে।

বিশাল পাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় এবং প্রধান অংশটিই পাল রাজারা প্রত্য(ভাবে শাসন করতেন, বাকী অঞ্চলগুলি বিভিন্ন সামন্ত বা অনুগত রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। এই আমলে সামন্ত প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় এবং বহু(ত্রেই এই সামন্তরাজারা প্রায় স্বাধীন ভাবেই তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চল শাসন করতেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, 'পাল বংশীয় রাজগণের চারি শতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকালে বাংলার শাসনপ্রণালী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল'। (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৭৫)

বাংলা, পুণ্ড্রবর্ধন, বর্ধমান ও দণ্ডভুক্তি(এই তিনটি ভুক্তি(তে বিভক্ত(ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ অর্থাৎ বাগড়ী অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি(র, ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল এবং পশ্চিমাংশ অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল বর্ধমান ভুক্তি(র অন্তর্গত ছিল। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্র্যাঘ্রতটী থেকেই 'বাগড়ী' শব্দের উৎপত্তি। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের মহামাণ্ডলিক বলবর্মণের নাম পাওয়া যায়। প্রথম দিকে উত্তর রাঢ় মণ্ডল-- মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল যার অন্তর্গত-- বর্ধমান ভুক্তি(র অন্তর্গত ছিল কিন্তু শেষের দিকে রামপালের সময় এই অঞ্চলে মহামাণ্ডলিক ঈ(র ঘোষ ও প্রতাপসিংহ এবং কজঙ্গল মণ্ডলের স্বাধীন অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে জেলার বাগড়ী অঞ্চল সম্ভবতঃ পালরাজারা প্রত্য(ভাবেই শাসন করতেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেলেও খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তবে পাল রাজারা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট তো ছিলেনই না বরং অন্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। পালরাজাদের মহামন্ত্রীরা অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের সময়ের যে সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এ জেলায় পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির দুই-ই আছে। অবশ্য পাল রাজত্বের অব্যবহিত পরেই সেনরাজারা এদেশে রাজত্ব করেন। সেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং বৌদ্ধ বিদ্বেষী। তাঁদের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পাল আমলে শিল্প, বিশেষ করে মূর্তি শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। সেন আমলেও এই মূর্তিশিল্প যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তির নিদর্শন থেকেও বোঝা যায়। পাল আমলেও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি প্রভূত পরিমাণে নির্মিত হয়েছে, সেন আমলে তো হয়েইছে। সাধারণের প(এই দুই আমলের ভাস্কর্যের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন (বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই দুই আমলের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। যাই হোক এই দুই আমলের মধ্যে কোনগুলি পাল আমলের আর কোনগুলি সেন আমলের তা নিশ্চিত ভাবে বলা বেশ কঠিন। তবে বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিগুলি যে পাল আমলেই নির্মিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাল আমলে মহাযান বৌদ্ধ- ধর্মের তান্ত্রিক বৌদ্ধদেব-দেবীর অজস্র মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এই জেলায় তার অনেকগুলিই বর্তমান। এগুলি কেবল মহীপাল- গিয়াসাবাদ অঞ্চলেই নয়, জেলার রাঢ় অঞ্চলের বহু জায়গায় এই সকল মূর্তি ভগ্ন এবং অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে পাল আমলে ধর্ম ও সমাজের একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ মূর্তিগুলির মধ্যে গিয়াসাবাদ থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড সংগৃহীত দ্বাদশভুজ লোকনাথ অবলোকিতে(রের একটি মূর্তি ও জিয়াগঞ্জের সাধকবাগে র(ত একটি অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুকারহাট গ্রামের 'ষষ্ঠীতলায়' একটি অত্যন্ত সুন্দর ভগ্ন পদ্মপানি বোধিসত্ত্ব মূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। সামশেরগঞ্জ থানায় জীয়ৎকুড়িতে (মৌজা হাসিমপুর) একটি ভগ্ন মন্দিরের পাথরের দেওয়ালে (োদিত মূর্তি, মহেশাইল, সাগরদীঘি, কিরীটে(রী ('ভৈরব' মূর্তি বর্তমানে অন্তর্হিত), অমরকুণ্ড (রঘুনাথরূপে পূজিত), শক্তি(পুর, ভরতপুর থানায় সিংহারি-গড্ডা, বড়এ(ার নিকটবর্তী গ্রামের বুদ্ধমূর্তিগুলি সেই আমলের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ভরতপুরে প্রাপ্ত এবং কান্দী থানা প্রাঙ্গণে নটরাজ রূপে পূজিত 'বৈরোচন' বুদ্ধের মূর্তিটি একটি অতি বিরল অসাধারণ মূর্তি। এই স্থানগুলি সবই রাঢ় অঞ্চলে। বাগড়ী অঞ্চলে বেলডাঙ্গার নিকটবর্তী নওপুকুর গ্রামের 'ডুমনীতলায়' একটি অপূর্ব সুন্দর তারামূর্তি (সম্ভবতঃ মহাশ্রী তারা) ও ভগ্ন বৌদ্ধ-মন্দিরের বেশ কিছু নিদর্শন বর্তমান। এইগুলি আদৌ ঐ স্থানেরই কিম্বা অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা তা জোর করে বলা যায় না। কান্দী শহরের রূপপুরের বিখ্যাত '(দ্রদেব' মূর্তিটি ভূমিস্পর্শে মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। সেটি এখন অপহৃত। পূর্বতন মূর্তির অনুকরণে নির্মিত আর একটি মূর্তি ঐ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। আগেকার মূর্তিটি দশম/একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে মনে করা হয়। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত এবং জিয়াগঞ্জ সংগ্রহশালায় র(ত প্রজ্ঞাপারমিতা এবং হারিতী দেবীর মূর্তিও এই জেলার গৌরব। এই জেলার সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার পাইকর, বারা, তারাপীঠ প্রভৃতি গ্রামগুলিতে প্রাপ্ত অনেক তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি থেকে এই অঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্মের, বিশেষত মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচলন ছিল তা অনায়াসেই বোঝা যায়।

এই সব মূর্তি ছাড়াও পাল আমলে নির্মিত বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। কর্ণসুবর্ণে যে পাল আমলে বেশ কিছু বৌদ্ধ নির্মাণকার্য হয়েছিল এবং পূর্বতন বৌদ্ধ বিহারাদির সংস্কার করা হয়েছিল তা কর্ণসুবর্ণ উৎখননের ফলে জানা যায়। পাঁচথুপির সংলগ্ন মহাদেববাটি মৌজায় (কান্দী থানা) বিখ্যাত বারকোণার দেউল যে অষ্টম নবম শতাব্দীতে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার বা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ তা ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বে(ণের

বিবরণী থেকে জানা যায়। বস্তুতঃ পাঁচথুপি ও আশেপাশে অবস্থিত পাঁচটি স্তূপ থাকায় 'পঞ্চস্তূপ' থেকে পাঁচথুপি নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া মহীপাল গিয়াসাবাদ অঞ্চলে পাল আমলের বৌদ্ধ মন্দিরাদির অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। সুতি থানায় মহেশাইল এবং নিকটবর্তী জীয়ৎকুড়িতেও বৌদ্ধমন্দির ছিল বলে মনে হয়। কান্দী থানায় বৈরোচন বুদ্ধের যে মূর্তিটি একটি প্রস্তরখণ্ডে ে োদিত সেটিও একটি বৌদ্ধমন্দিরের অংশ বলে মনে হয়। ডুমনীতলায় বৌদ্ধমন্দিরের দেওয়াল বা স্তম্ভে ে োদিত কয়েকটি ভগ্ন বৌদ্ধমূর্তি র(িত আছে। পাল আমলে সমগ্র জেলায় যে বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল প্রসার ছিল এগুলি তারই অভ্রান্ত নিদর্শন।

পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও যে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল জেলায় তারও বহু নিদর্শন বর্তমান। এই আমলের বহু পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ জেলার সব অঞ্চলেই পাওয়া গিয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাগরদীঘির সন্নিকটে চন্দনবাটি গ্রামে একটি বিশাল মন্দির এবং অন্যান্য গৃহের ধ্বংসাবশেষ। ডঃ সুধীর রঞ্জন দাস মনে করেন এই মন্দির নির্মিত গুপ্ত পরবর্তীকালে। ব্যক্তি(গত উদ্যোগে এখানে খননকার্য চালান হয়, সেই জন্য এই বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কি পাওয়া গিয়েছিল জানা যায় না। বিশাল শিবলিঙ্গ এবং গৌরীপট্টটি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ। নিকটেই ভাঙ্গা মিল্কি গ্রামে (মৌজা সমসাবাদ) প্রাপ্ত একটি বিষু(মূর্তিও এই আমলের বলে মনে করা হয়। সমসাবাদের ষষ্ঠীতলায় পূজিত একটি সুন্দর উমা-মহে(ের মূর্তিও ঐ আমলের ভাস্কর্যের নিদর্শন। পা(বর্তী গ্রাম সুকীতে (থানা নবগ্রাম) দুটি বিষু(মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলিও সম্ভবতঃ ঐ সময়ের। কান্দী থানার নবগ্রামের কাত্যায়নী মূর্তি ও গ(ড়বাহন বিষু(মূর্তি সম্ভবতঃ সেন আমলের। গোকর্ণের (কান্দী থানা) বিখ্যাত নৃসিংহমূর্তিটি ডেভিড ম্যাককাচ্চন পাল আমলের বলে মনে করেন (Census, 1961)। কান্দীর নিকট বাটি গ্রামের শিবলিঙ্গের উপর ে োদিত অর্ধনারী(ের মূর্তিও ভাস্কর্যের বিচারে এই সময়ের বলেই মনে হয়। কান্দীর নিকট যশোহরিতে নৃত্যরত দ্বাদশভূজ মহারুদ্রদেব এবং গোলাহাটের সরস্বতী মূর্তিও সম্ভবতঃ এই সময়েরই। পাঁচথুপির দুর্গামূর্তিও এই সময়ের ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়াও সালারের বিষু(মূর্তিগুলি, শাবলপুরের (থানা বড়এ(া) বিষু(ও সূর্য, অমরকুণ্ডের (থানা নবগ্রাম) বিষু(, সূর্য ও বুদ্ধ, ভরতপুর থানার দ(ণখণ্ড এবং জলসুতি গ্রামের বিষু(মূর্তিগুলিও হয়ত এই যুগেরই শিল্পকীর্তি। আজিমগঞ্জের কাছে কুসুমখোলায় প্রাপ্ত এবং বড়নগরের মন্দিরে র(িত হয়গ্রীব-বিষু(মূর্তি একটি বিরল ভাস্কর্যের নিদর্শন। জিয়াগঞ্জের সংগ্রহশালায় নানা দেব-দেবীর (বিষু(, ব্রহ্মা, পার্বতী, বুদ্ধ প্রভৃতি) অনেক মূর্তি র(িত আছে। সাধকবাগেও (জিয়াগঞ্জ) বুদ্ধ, বিষু(এবং সূর্য মূর্তি রেখে দেওয়া হয়েছে। জেলার আরও অনেক জায়গায় ঐ আমলের অনেক মূর্তি মন্দিরে পূজিত হচ্ছে। তবে এই সকল মূর্তির মধ্যে যে অনেকগুলিই সেন আমলের ভাস্কর্যের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেন আমল ঃ সেন রাজাদের পূর্ব পু(ষ দা(ণাত্যের কর্ণাট দেশ থেকে এদেশে এসে রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে তাঁরা ঠিক কোন সময়ে কর্ণাট থেকে এদেশে আসেন তা সঠিক জানা যায় না। পাল আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁদের সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হত (তার মধ্যে কর্ণাট ছিল। কর্ণাট থেকে আগত হয়ত তাঁদেরই কেউ কালত্র(মে সুযোগ পেয়ে রাঢ় অঞ্চলে (দ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অন্যমত অনুসারে পাল আমলে দা(ণাত্যের কর্ণাট দেশের চালুক্যরাজগণ একাধিকবার বাংলায় সমরাভিযান করেন। খুব সম্ভবতঃ এইসব অভিযানে এদেশে এসে কেউ কেউ এদেশেই থেকে গিয়েছিলেন এবং পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। যাইহোক সেন রাজা বিজয়সেনের দেওপাড়া (রাজশাহী জেলা) লিপিতে বলা হয়েছে সেনদের পূর্ব পু(ষ 'সামন্ত সেন রামে(ের পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান করিয়া এবং দুর্বৃত্ত কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারী শত্রুকুলকে ধ্বংস করিয়া শেষ বয়সে গঙ্গাতটে পুণ্যাশ্রমে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ১৩৩-৩৪)। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় সামন্তসেনই প্রথমে কর্ণাট থেকে এদেশে আসেন। কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, 'চন্দ্রের বংশে জাত অনেক রাজপুত্র রাঢ়দেশের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন ও তাঁহাদেরই বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন'(ঐ পৃঃ ১৩৪)। যাই হোক সামন্তসেন এখানকার সেন বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি(। তবে লিপিতে তাঁকে বলা হয়নি, তাঁর পুত্র হেমন্তসেনকেই 'মহারাজাধিরাজ' বলা হয়েছে, অর্থাৎ হেমন্তসেনই প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেন রাজারা ব্রহ্ম(ত্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা ব্রাহ্মণ এবং (ত্রিয় উভয় বর্ণের ধর্মানুষ্ঠান ও অন্যান্য করণীয় কাজকর্ম করতেন। তাঁদের কর্ণাট (ত্রিয়ও বলা যায়।

বিজয়সেন ঃ হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮) পরাত্র(ান্ত রাজা ছিলেন। 'রামচরিতে' রামপালের অন্যতম সাহায্যকারী সামন্তরাজারূপে 'নিদ্রাবলী'র বিজয়রাজের উল্লেখ আছে। এই বিজয়রাজকেই সেনরাজা বিজয়সেন বলে ধরে নেওয়া হয়। এই নিদ্রাবলীর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না।

'রামচরিত' ছাড়া অন্য কোথাও নিদ্রাবলীর উল্লেখ নাই। থাকলে নিদ্রাবলীর অবস্থান নির্ণয় করা অপে(াকৃত সহজ হত। তবে নিদ্রাবলী যে উত্তররাঢ় (অজয় নদের উত্তর থেকে গঙ্গা নদীর দ(িণ তীর পর্যন্ত উত্তর রাঢ়) অঞ্চলে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নিদ্রাবলী অধুনা বর্ধমান জেলায় কেতুগ্রাম থানার 'নিরোল' গ্রাম (মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল, কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যরঞ্জন বক্সী)। এই স্থান নির্দেশ সম্ভবতঃ ঠিক নয় কারণ নিরোল উত্তর রাঢ়ে হলেও এবং নামের সাদৃশ্য থাকলেও কাটোয়া থেকে প্রায় পনের / কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমে এই গ্রামটি গঙ্গাতীর থেকে অনেকটা দূরে। অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন দাসের মতে নিদ্রাবলী মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে। প্রসঙ্গত্র(মে বলা যায় সেনরাজাদের মোট তিনটি রাজধানীর সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি হল-বিত্র(মপুর, গৌড়পুর (গৌড় - ল(্মণাবতী) ও স্বর্ণগ্রাম। এছাড়া নবদ্বীপেও তাঁদের রাজার আবাসস্থল বা অস্থায়ী রাজধানী ছিল। বিত্র(মপুর প্রধান রাজধানী, পূর্ববঙ্গে অবস্থিত এবং গৌড়-ল(্মণাবতী বর্তমান মালদহ জেলায়। স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রাম রাঢ় দেশের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল এবং কর্ণসুবর্ণই এই নগর বলে ডঃ দাস ইঙ্গিত করেছেন (কর্ণসুবর্ণ, পৃঃ ২১৬)। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সেন আমলে রচিত কৃষ(মিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে গৌড় দেশের অন্তর্গত এক রাঢ়াপুরীর উল্লেখ আছে। এই নগর বর্তমান ফরাক্কার কিছুটা দ(িণে বর্তমান ধুলিয়ানের কাছাকাছি এবং গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত জাও-ডি-ব্যারোস (Jao-De-Baros) এবং ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের গ্যাসটালডির (Gastaldi) অঙ্কিত নক্সাতে ঐ রাঢ়া (Rara) বা রাঢ়াপুরীর অবস্থান দেখান হয়েছে। এই রাঢ়াপুরীই কি রাঢ় দেশের প্রধান নগর নিদ্রাবলী? অবশ্য নিদ্রাবলী আদৌ নগর কিম্বা রাজ্যের নাম কিনা তাও সঠিক বলা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় বীরভূম জেলার পাইকরে বিজয়সেনের একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। একটি মুণ্ডহীন মনসামূর্তি-সমন্বিত স্তম্ভগাত্রে মাত্র এই কটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে — 'রাজেন শ্রী বিজয় সে...'। বাকী অংশ বিলুপ্ত। এ থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেকে মনে করেন, বিজয়সেন সেই সময় এই অঞ্চলেরই রাজা ছিলেন। যাই হোক এই পাইকর পূর্বোল্লিখিত রাঢ়া নগর থেকে খুব দূরবর্তী নয়, আবার কর্ণসুবর্ণ থেকে দূরত্ব কিছুটা বেশী হলেও বহুদূরে নয় সুতরাং সেকালের নিদ্রাবলী এ দুটি স্থানের একটি হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে সেই সময় যে মুর্শিদাবাদের পূর্ব অংশ অর্থাৎ বাগড়ী অঞ্চল বিজয়সেনের রাজ্য বহির্ভূত এবং পালরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত(ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

বিজয়সেন শক্তি(শালী রাজা ছিলেন। তিনি দ(িণ রাঢ়ের অধিপতি শূরবংশীয় রাজার কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে অবশ্যই তাঁর শক্তি(বৃদ্ধি হয়। যাইহোক রামপালের পর পালবংশের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি তাঁর শক্তি(বৃদ্ধি করেন এবং বর্মরাজকে পরাজিত করে পূর্ব ও দ(িণ বঙ্গ অধিকার করেন। দেওপাড়া শিলালিপি অনুসারে তিনি নান্য, বীর, রাঘব, বর্ধন প্রভৃতি রাজগণকে পরাজিত করেন এবং কামরূপরাজকে দূরীভূত এবং কলিঙ্গরাজাকে পরাভূত ও গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য করেন। সেন রাজাদের মতই কর্ণাটদেশীয় নান্যদেব (১০৯৭ - ১১৪৭) মিথিলায় রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে বিজয়সেনের সংঘর্ষ হয় এবং তিনি পরাজিত হন। বীর ও বর্ধন সম্ভবতঃ রামচরিতে উল্লিখিত কোটাটবীর বীরগুণ এবং কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। রাঘব সম্ভবতঃ কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মণ চোরগঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র। কামরূপরাজ সম্ভবতঃ আসামের রাজা বৈদ্যদেব। গৌড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই (ঐ-১৩৭)। এ থেকে বোঝা যায় সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে এবং বরেন্দ্রের অন্ততঃ একটি অংশে বিজয়সেনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ - ১৩৮)।

বিজয়সেনের প্রধান কৃতিত্ব তিনি খণ্ড-ছিন্ন বঙ্গদেশকে এক অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করে এক দৃঢ়বদ্ধ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। পাল আমলের শেষ দিকে সমগ্র পাল সাম্রাজ্য অসংখ্য (ুদ্র (ুদ্র রাজ্যে বিভক্ত(হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সব রাজ্যে সামন্ত রাজগণ শক্তি(শালী হয়ে পরস্পর শত্রুতা এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফলে দেশে আবার ঘোরতর অশান্তি এবং অরাজকতার সৃষ্টি হতে চলেছিল। হয়ত দেশে আবার একটি মাৎস্যন্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত। বিজয়সেন এর হাত থেকে বাংলাকে র(া করেন।

বল্লালসেন ঃ বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন (১১৫৮-১১৭৯) রাজা হন। তিনি একদিকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং অন্যদিকে শক্তি(মান রাজা ছিলেন। তিনি 'দানসাগর' এবং 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বল্লালচরিত' অনুসারে তিনি গৌড়ের (সে সময় গৌড় রাজ্য বিহারের একটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল) রাজা মদনপালকে পরাজিত করেন এবং মিথিলা (উত্তর বিহার) জয় করেন। তাঁর রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত(ছিল — বঙ্গ (পূর্ব ও দ(িণ পূর্ব বাংলা), রাঢ় (পশ্চিম বাংলা), বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা), বাগড়ী এবং মিথিলা। বাগড়ীকে